# গুঞ্জন

মাসিক ই-পত্রিকা

বর্ষ ৩, সংখ্যা ৯

ফেব্রুয়ারী ২০২২

প্রেম সংখ্যা

বিংশ শতাব্দীর বাংলা ভাষায় যেমন ইংরাজীর প্রভাব অতি স্পষ্ট, ঠিক তেমনই আজকের বাংলা ভাষায় হিন্দী এবং অন্যান্য ভারতীয় বা পাশ্চাত্য ভাষার শব্দ এবং ভাবভঙ্গীর আপনায়নের চেষ্টা সুস্পষ্ট। নব্য প্রজন্মের মধ্যে এই প্রবণতা মাত্রাতিরিক্ত, যার ফলে বহুলাংশে বাংলা ভাষার মৌলিকত্ব অত্যন্ত দ্রুত এবং কদর্যভাবে আক্রান্ত হচ্ছে। তাই বাংলা ভাষার প্রকৃত রূপ ও মাধুর্য হারিয়ে যাওয়ার আগে আমাদের সজাগ হতে হবে...

**কলম হাতে**

ডাঃ অমিত চৌধুরী, পিনাকী বিশ্বাস, অনির্বাণ বিশ্বাস, অনন্যা দাস, বিজয়া সরকার, দেবী প্রসাদ চৌধুরী এবং পাণ্ডুলিপির অন্যান্য সদস্যরা...

**প্রকাশনা**

পাণ্ডুলিপি (গল্প, কবিতা, গান, গদ্য ও নাটকের আসর)

বি.দ্র.: লিটল ম্যাগাজিন হিসাবে মুদ্রিত এই পত্রিকাটির প্রথম প্রকাশ হয় ইং ১৯৭৭ সালে...

@Pandulipi

যোগাযোগের ই-মেলঃ contactpandulipi@gmail.com

# পায়ে পায়ে

সাহিত্যের জগৎ হল একটা স্রোতস্বিনী নদীর ন্যায়, যা নানান শাখা-উপশাখা নিয়ে বয়ে চলে অদূর ভবিষ্যতের অভিমুখে। সাহিত্যে আমরা বিভিন্ন ধারা পরিলক্ষিত হতে দেখি। সেই নানান ধারার মধ্যে অন্যতম ও অদ্বিতীয় ধারা হল 'প্রেম'। ঝিনুকের মধ্যে মূল্যবান মুক্তোর মত 'প্রেমের মুক্ত' সাহিত্যকে দেয় লেখায় নতুন প্রাণোজ্জ্বল দিশা। আর যদি হয় কবিতার শাখাতে প্রেমের স্পর্শ, মন হয় আবেগে আপ্লুত।

তাই প্রেমের কবিতা দিয়েই আমাদের 'গুঞ্জন' ই-পত্রিকাটির ফেব্রুয়ারি সংখ্যাটি সাজিয়ে তোলা হয়েছে। একদিকে যেমন ধারাবাহিক গল্পের সৌকর্য রয়েছে, অপর দিকে তেমন রয়েছে প্রেমের কবিতার লাবণ্য। এই দুই স্বাদের আস্বাদন নিতে প্রতিটি লেখা পাঠকের মনে আনবে অনাবিল মুগ্ধতা।

এছাড়া রয়েছে খেলার খবর আর বিজ্ঞানের নতুন দিশার কিছু তথ্য। তাই শুধু পড়া নয়, পড়ার সাথে সাথে আপনার মূল্যবান মতামত লিখে, নিজের ছবিসহ পাঠিয়ে দিন আমাদের দপ্তরে। সবচেয়ে সেরা লেখা পাবে আপনাদের 'গুঞ্জন'-এ বিশেষ স্থান।

সবাই সুস্থ থাকুন ও ভালো থাকুন। ■

**বিনীতাঃ রাজশ্রী দত্ত (নীলাঞ্জনা), সম্পাদিকা, গুঞ্জন**

**বিনীতঃ প্রশান্তকুমার চট্টোপাধ্যায় (পিকে), নির্বাহী সম্পাদক, গুঞ্জন**

# পাণ্ডুলিপির প্রকাশিত গ্রন্থ

রহস্য গল্পের প্রাপ্তবয়স্ক পাঠকদের জন্য আর একটি অবশ্য পঠনীয় গ্রন্থ "রহস্যের ৬ অধ্যায়" প্রকাশিত হয়েছে। আধুনিক যুগের পটভূমিতে, মানুষ কেমনভাবে নিজেনিজেই রহস্যের জালে জড়িয়ে পড়ছে – আর সেই আবর্তে কিভাবে পিষ্ট হচ্ছে, তাই নিয়েই এই ছয়টি গল্পের রচনা। কলকাতার কলেজ স্ট্রীটে 'অরণ্যমন'এর স্টল থেকে বইটি সংগ্রহ করতে ভুলবেন না।

**কলকাতার অন্যান্য বুক স্টলেও বইটি পাওয়া যাচ্ছে...**

# কলম হাতে

# হস্তাঙ্কন

ছবির নামঃ বাংলার নারী...

শিল্পীঃ রিত্বিকা চ্যাটার্জি ✧ বয়সঃ ১২ বছর

© শিল্পীর লিখিত অনুমোদনে গৃহীত। নকল করা নিষিদ্ধ।

**সবাই জানাবেন এই উদীয়মান শিল্পীর ছবিটি কেমন লাগল...**

আমরা ছোটদের আঁকা ভাল ছবি চাই। অবশ্যই পাঠানো ছবি মনোনীত হলে তা ‘গুঞ্জন’-এ প্রকাশিত হবে, তিন মাসের মধ্যে। কোন প্রাপ্তিস্বীকার করা সম্ভব নয়। শিল্পীর নাম ও বয়স চাই। আমাদের ই-মেলঃ contactpandulipi@gmail.com

ভাষা দিবস

# ২১ শে ফেব্রুয়ারী

বিজয়া সরকার

ইয়ের রক্তে পূর্ব আকাশ
হয়েছিল লাল
তবুও কিন্ত ভাষার আন্দোলন
হয়নিকো ম্লান
নিজের ভাষা তো ভাই
সকলেরই প্রিয়
সেই ভাষার জন্য লড়াই
করবে না কেন বলো!
শিলচরের ভাইদের
আত্ম-ত্যাগের কথা
অমর গাঁথা হয়ে আছে
কেউ ভোলেনি সে কথা
যুগ যুগ কেটে গেছে
ভাষার দাবী নিয়ে
রক্ত গঙ্গা বয়েছিল
মেঘনার জলে
ঢাকার রাস্তাও হয়েছিল
ভাইয়ের রক্তে লাল।
তাদের ত্যাগ যায়নি বিফলে

## ভাষা দিবস

পেয়েছে সম্মান
বাংলা ভাষা পেয়েছে
আন্তর্জাতিক মান।
তাইতো আজও বাংলার মানুষ
সানন্দে পালন করে
২১ শে ফেব্রুয়ারী
ভাষা দিবস বলে। ■

নমামি দেবী নর্মদে

# শিব দুহিতা নর্মদা

পঞ্চম পর্যায় (৬)

ডাঃ অমিত চৌধুরী

সাধুটি আমার পাশে চোখ বন্ধ করে বসে আছেন। নর্মদা আমার ডানদিক থেকে বাঁদিকে বয়ে চলেছে। উনি হঠাৎ বলে উঠলেন যোগীরা এই নর্মদাকে মূলাধারে অবস্থিতা সর্পাকৃতি কুলকুন্ডলীনি শক্তির সাথে তুলনা করেন। ত্রিকোনাকৃতি মূলাধারে এর অবস্থান। যেমন মেখল, বিন্ধ্যাচল এবং সাতপুরাতে নর্মদার অবস্থান। একটি করে ঘাট পেরিয়ে অর্থাৎ এক একটি করে চক্র ভেদ করে কুলকুন্ডলীনি শক্তি সহস্রারের দিকে এগিয়ে চলেছে। ঠিক যেনো নর্মদা সাগরের দিকে মিলিত হওয়ার জন্য এগিয়ে চলেছে। এ যেন জীবত্মার সাথে পরমাত্মার মিলন।

সাধুটি চোখ বন্ধ করে বলে চলেছেন। পরিক্রমাবাসীরা এক একটি ঘাট অতিক্রম করে সাগরের দিকে এগিয়ে যায়, আর সর্পাকৃতি কুলকুণ্ডলীনি শক্তি ঘুম ভেঙে উপরে উঠতে থাকে। তখন পরিক্রমাবাসীদের নানা রকম অলৌকিক দর্শন হয়, নানান ধ্বনি তাঁরা শুনতে পান। এটা আগেও হতো এখনো হয় এবং চিরকালই হবে। এই ধ্বনিকে বলা হয় নাদ বা ওঙ্কার ধ্বনি বা রব। সেই শব্দ বা রবের

থেকেই নর্মদার আর এক নাম হয়েছে রেবা। নর্মদা তটের সাধুরা বা পরিক্রমাবাসীরা অতি অল্প চেষ্টাতেই মায়ের কৃপায় এই রবটি শুনতে পান। তখন মা আর সন্তানের মধ্যে কোনো পার্থক্য থাকে না। সব একাকার হয়ে যায়। অনেকটা নুনের পুতুল সমুদ্রের জলের গভীরতা মাপতে গিয়ে নিজেই জলের সাথে মিশে যাওয়ার মতো। মা নর্মদা তাঁর সন্তানকে যে কিভাবে লক্ষ্যে রাখেন সেটি প্রতি পদক্ষেপে তাঁর সন্তানরা উপলব্ধি করেন। কারণ সাধনার পথ খুবই দুর্গম, একমাত্র নর্মদা পরিক্রমাই সহজ সাধনার পথ। ঠিক যেন শিশু হামাগুড়ি দিতে দিতে মায়ের কোলে উঠে পড়তে পারে। সাধুটি মাঝে মাঝে কেঁপে উঠছেন। কিছুক্ষণ নর্মদার দিকে তাকিয়ে আবার চোখ বন্ধ করে বলে উঠলেন — মার্কন্ডেয় মুনি সপ্ত কল্পজীবি। ব্রহ্মার একটি দিন-রাত হলো একটি কল্প এবং এই এক-একটি কল্পের শেষে সব বিলুপ্ত হয়ে যায়, কিন্তু মার্কন্ডেয় আর মা নর্মদা ছাড়া সাতটি কল্প হলো — ও কৌর্ম, পুর, কৌশিক, মায়ুর, দ্বিরদ, মাৎস্য এবং বরাহ। চোখ বন্ধ করেই বলে চলেছেন, মাঈ গঙ্গা যখন পৃথিবীতে আসেননি তাঁর চেয়ে অনেক আগেই জীবের কল্যানের জন্য মাঈ নর্মদা পৃথিবীতে এসে গেছেন। একমাত্র নর্মদারই পরিক্রমা বিধি আছে। অন্য কোনো নদীর তা নেই।

রাত কত হবে জানি না। উনি একটু নড়ে চড়ে বসলেন। দেখলাম ওনার পুরুষাঙ্গটি শিখল দিয়ে বাঁধা। আমি

# নমামি দেবী নর্মদে

শুনেছিলাম এরা বৈষ্ণব নাগা সম্প্রদায়ের সাধু। কাম দমনের জন্য এটাই নাকি এঁদের পরম্পরা।

উনি বলে চলেছেন, 'নর্মদার তটে সবাই আসে শাপ মোচনের জন্য তপস্যা করতে। যার যেমন কর্ম তাকে সেই ভাবেই মা প্রায়শ্চিত্ত করিয়ে নেন।' এই রকম কথা আমি নর্মদা তটের অন্য সাধুদের মুখেও শুনেছিলাম।

**"অলক্ষ-লক্ষ-লক্ষপাপ-লক্ষসারসায়ুধং**
**ততস্তু জীবজন্তুতন্তু-ভুক্তি-মুক্তিদায়কম্।**
**বিরনচি-বিষ্ঞু-শঙ্করং-স্বকীয় ধাম বর্মদে,**
**ত্বদীয় পাদ পঙ্কজং নমামি দেবী নর্মদে।।"**

অন্ধকার আকাশে শুকতারা দেখা যেতেই সাধুটি উঠে পড়লেন। ব্রহ্ম মুহূর্ত নষ্ট করতে চাইলেন না। স্নান করতে চলে গেলেন। সারারাত নাগেশ্বর শিবের পূজা হয়েছে। তার মন্ত্রধ্বনি শোনা যাচ্ছে এখনো। কিন্তু সাধুটি কোথায়? অসংখ্য মানুষের ভীড়ে নর্মদার ঘাটে উনি হারিয়ে গেলেন। বহু মানুষ স্নান করছেন তার মধ্যে আলাদা করে সাধুটিকে খুঁজে পেলাম না।

রাতটা যে কিভাবে কেটে গেলো বুঝতে পারিনি, তার ঘোর এখনো রয়েছে। কিন্তু এখন আর সময় কাটতে চাইছে না। নর্মদা আর শিবের দর্শন করে এলাম। আমরা তৈরী হয়ে বেড়িয়ে পড়েছি, লক্ষ্য ইটাশ্রী হয়ে হাওড়া। আবার অপেক্ষা। একটা দীর্ঘশ্বাস বুক চীরে কখন যে বেড়িয়ে এলো বুঝতে পারিনি।

দিব্যানন্দজীর কথায় ঘোর কাটলো। বললেন, "ডাঃ বাবা শরীর ঠিক আছে তো?" বললাম, "হ্যাঁ ভাই শরীর ঠিক আছে তবে মন নয়। চলো এগিয়ে যাই। আবার দেখা হবে।" নর্মদে হর।

(পঞ্চম পর্ব সমাপ্ত) ■

# লেখকদের প্রতি অনুরোধ

**'গুঞ্জন' একটি আন্তর্জাতিক নিঃশুল্ক সাহিত্য পত্রিকা, যার অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য হল নতুন লেখকদের পাঠকদের কাছে তুলে ধরা, এবং তাঁদেরকে বাংলা ভাষায় সাহিত্য সৃষ্টিতে উৎসাহিত করা।**

**তাই আমাদের দপ্তরে লেখা পাঠাবার আগে নিজেই কয়েকবার পড়ে দেখুন, আপনার লেখার মান কি গ্রহণযোগ্য? 'এডিটিং' করে ভুল বানান বা যতি চিহ্নের প্রয়োগগুলি শুধরে নিন। অনিবার্য কারণ বশত আমরা আমাদের লেখা নির্বাচনের নিয়মে এবার কিছ বদল করছি।**

# আলোক চিত্র

ছবির নামঃ হারিয়ে যাচ্ছে কাঠবিড়ালি...

আলোকচিত্র গ্রাহকঃ প্রশান্তকুমার চট্টোপাধ্যায় (পিকে)

© শিল্পীর লিখিত অনুমোদনে গৃহীত। নকল করা বারণ।

সবাই জানাবেন এই আলোকচিত্রটি কেমন লাগল...

## নতুন বই
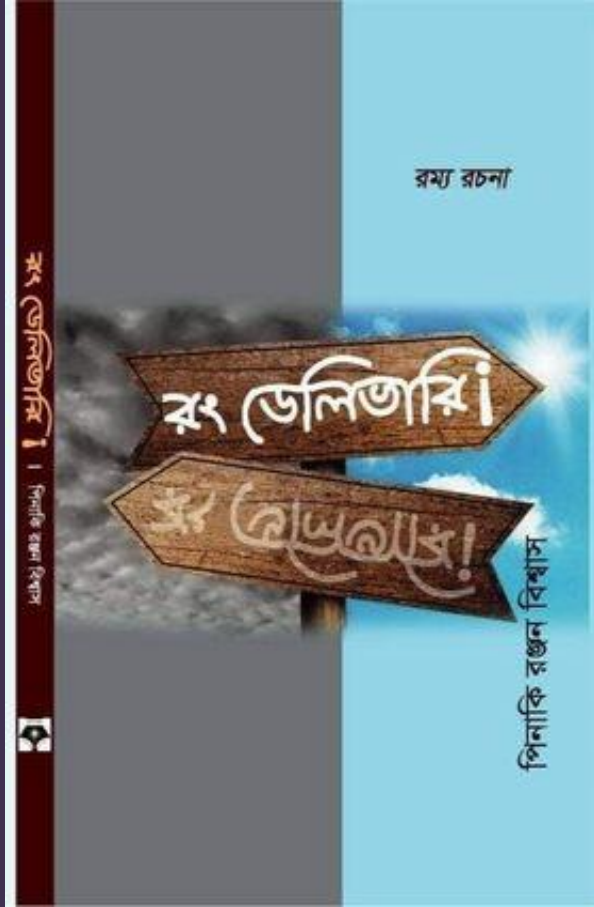
# প্রতি পাতায় ভরা হাসি

# যা কখনও হয়না বাসী...

## সুসাহিত্যিক পিনাকি রঞ্জন বিশ্বাসের একটি অপূর্ব

## রম্য রচনার সমাহার...

**প্রাপ্তিস্থলঃ**

**https://www.rokomari.com/book/202818/rong-delivery**

**ভারতে শীঘ্রই আসছে...**

# আত্মবিশ্বাসের জয়

সুজন ভট্টাচার্য

***আত্মবিশ্বাস এবং সহনশীলতাই ঘরে এনে দেয় পঞ্চম বিশ্বকাপ :-***

যশ ধুলের নেতৃত্বে ভারতের অনূর্ধ্ব-১৯ দল ৬ ফেব্রুয়ারীর রাতে অ্যান্টিগায় ইংল্যান্ডকে চার উইকেটে হারিয়ে আইসিসি অনূর্ধ্ব-১৯ পুরুষ ক্রিকেট বিশ্বকাপ জিতে নেওয়ার ঠিক পরেই ন্যাশনাল ক্রিকেট একাডেমির প্রধান ভিভিএস লক্ষ্মণ এই বিজয়ে খেলোয়াড়দের সঙ্গে নির্বাচকদের ভূমিকাকেও যথেষ্ট কৃতিত্ব দেন।

এটি আইসিসি অনূর্ধ্ব-১৯ পুরুষ ক্রিকেট বিশ্বকাপে ভারতের পঞ্চমতম জয়। নির্বাচকদের চেয়ারম্যান, প্রাক্তন তামিলনাড়ু এবং দক্ষিণ অঞ্চলের ব্যাটিং স্টলওয়ার্ট, এস শরথের নেতৃত্বে, হরবিন্দর সিং সোধি, রণদেব বোস, পথিক প্যাটেল এবং কিষাণ মোহনকে নিয়ে গঠিত প্যানেলটির সামনে এই মহামারীর সময়ে এরকম একটি দলকে একত্রিত করে প্রস্তুত করার মস্ত বড় চ্যালেঞ্জ ছিল। তবু এরা জুনিয়র বিশ্বকাপ জেতে।

একটি নিউজ চ্যানেলে সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে শরথ জানান, তিনি এবং তাঁর প্যানেল কি কি প্রক্রিয়া গ্রহণ করেছিলেন।

অনূর্ধ্ব-১৯ ক্রিকেটারদের বাছাই করার ক্ষেত্রে তাঁরা যে চ্যালেঞ্জগুলির মুখোমুখি হয়েছিলেন এবং তাঁরা যেভাবে কাজটি সম্পন্ন করেছিলেন সে সম্পর্কেও কথা বলেন।

বেশ দেরিতে, ২০২১ সালের সেপ্টেম্বরে, ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের দ্বারা সমস্ত নির্বাচকদের বাছাই করা হয়েছিল। তাঁরা রাহুল দ্রাবিড়ের সাথে জাতীয় ক্রিকেট একাডেমিতে দেখা করেছিলেন এবং একটি পরিকল্পনা তৈরি করেছিলেন। প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক তাঁদের পরামর্শ দিয়েছেন কীভাবে কাজটি এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে।

তাঁদের নব্বইজন জন খেলোয়াড়ের একটি পুল বাছাই করতে হয়েছিল – অর্থাৎ ১৫ জন খেলোয়াড়ের ছয়টি দল। সাদা বলের দল বাছাই করার জন্য নব্বইজন খেলোয়াড় ছিল ভালো সংখ্যা। চ্যালেঞ্জার কাপ আগে থাকাতে বেশ সুবিধা হয়েছিল।

শরথ বলেন, স্বাভাবিক পরিস্থিতি হলে নির্বাচকরা ঘরোয়া টুর্নামেন্ট দেখতেন এবং তা থেকে খেলোয়াড়দের সম্পর্কে সঠিক ধারণা করতে পারতেন। কিন্তু এবার কোভিড পরিস্থিতি তাঁদের প্রত্যেকের জন্য কঠিন চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছিল। দুই বছর ঘরোয়া ক্রিকেট হয়নি। ছেলেদের ঘরে বসে থাকাটাই তো একটি বড় চ্যালেঞ্জ ছিল। এটি একটি বেশ কঠিন পরিস্থিতি ছিল।

“বায়ো বাবুলে থাকাটা শক্ত কাজ। সেই দৃষ্টিকোণ থেকে,

ছেলেরা যেভাবে বেরিয়ে এসে টুর্নামেন্টে নিজেদের প্রকাশ করেছে তা ছিল অসাধারণ। মহামারী চলাকালীন একটি টুর্নামেন্ট পরিচালনা করার উপায় খুঁজে বের করার জন্য বিসিসিআইকেও শুভেচ্ছা," শরথ বললেন।

শরথ আরও বলেন, "সব টুর্নামেন্ট জেতার কথা ভাবতেই পারেননি তাঁরা। এশিয়া কাপ এবং বিশ্বকাপে দুটি বড় টুর্নামেন্টে ভালো লড়াই করতে পারে এমন একটি দল তৈরি ও বাছাই করার প্রক্রিয়াতেই শুধু তাঁরা কঠোর পরিশ্রম করেছিলেন। এটা ধাপে ধাপে যাওয়ার ব্যপার ছিল। বাংলাদেশের সঙ্গে ত্রিদেশীয় সিরিজটি ভাল চোখ খুলে দিয়েছিল, কারণ ভারত খুব খারাপভাবে হেরেছিল। ইতিবাচক এটাই ছিল যে থিঙ্ক ট্যাঙ্ক এবং খেলোয়াড়রা ত্রুটিগুলি সম্পর্কে জানতে পেরেছিলেন এবং সেগুলোকে সংশোধন করতে পেরেছিলেন।"

"আমরা ইন্ডিয়া 'এ' এবং ইন্ডিয়া 'বি' হিসাবে দলকে বিভক্ত করে খেলেছি। আমরা এটি থেকে খুব বেশি বিচার করতে পারিনি, তবে আমাদের কোথায় কোথায় ত্রুটি রয়েছে তা বোঝা গিয়েছিল। আমরা বসে কোচদের সাথে একটি পরিষ্কার চার্ট তৈরি করেছিলাম। সেখানে ভিভিএস লক্ষ্মণও ছিলেন। আমরা সঠিক সংমিশ্রণ খুঁজে পেয়েছিলাম," শরথ বললেন।

ক্যাপ্টেন খুঁজে বের করার চ্যালেঞ্জ সম্পর্কে শরথ বললেন

যে ক্যাপ্টেন হিসাবে যশ ধুলের পছন্দ সোজা ছিল। সেখানে শাইক রশিদ এবং নিশান্ত সিন্ধুও ছিলেন, কিন্তু ধুল ছিলেন অসাধারণ। শরথ বললেন, "ও সবার সঙ্গে ভাল যোগাযোগ স্থাপন করতে পারছিল, সবার মতামতের প্রতি উন্মুক্ত ছিল, দলে ইতিবাচক মনোভাব নিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছিল, সবসময় ছেলেদের উৎসাহিত করত, এবং খেলায় সক্রিয় থাকত। ধুলই দলনেতা পদের জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত ছিল।"

ধুলের নেতৃত্বে ছেলেদের মধ্যে গড়ে ওঠে চমৎকার আত্মবিশ্বাস এবং দৃঢ় সহনশীলতা। এই দুটিই ছিল ভারতের বিশ্বকাপ বিজয়ের মূল কারণ, তিনি জানান। যদিও ভারতের জন্য জয়গুলি খুব মসৃণ ছিল, পূর্ববর্তী চ্যালেঞ্জগুলি তাদের ভীষণভাবে সাহায্য করেছিল। আয়ারল্যান্ডের বিরুদ্ধে খেলার জন্য (লীগ পর্বে ১৭৪ রানে জিতেছিল), মাঠে ভারতীয় দলের নেমেছিল মাত্র ১১ জন – কারণ তাদের মধ্যে বেশ ক'জন কোভিড-আক্রান্ত হয়ে পড়েছিল।

"এটি সত্যিই তাদেরকে খুব নাড়িয়ে দিয়েছিল। সত্যি বলতে কি নির্বাচক, ম্যানেজমেন্ট ইত্যাদি — আমাদের সবাইকেই নাড়িয়ে দিয়েছিল। পরিস্থিতি সহজ ছিলনা, ছেলেরা একদিকে কোভিড-এ ভুগছিল, অন্যদিকে বাড়ি থেকে অনেক দূরে খেলছিল। আমরা সবাই খুব চিন্তিত ছিলাম। কিন্তু এটাই তাদের মানসিকভাবে আরও শক্তিশালী করে তুলেছিল।"

বাংলাদেশের বিপক্ষে ছেলেরা ১১২ রানের ছোট টার্গেট তাড়া করতে গিয়েও পাঁচ উইকেট হারিয়ে ফেলেছিল। সেই পরিস্থিতি থেকে বেরিয়ে আসাই তাদের মানসিক শক্তি আরও বাড়িয়ে দিয়েছিল। ফাইনালে ৫০ স্কোর করে রশীদ ভারতকে একটি ভালো সূচনা দিয়েছিল। যদিও দলের সব ছেলেরাই বিশাল এই সাফল্যে অবদান রাখতে পেরেছিল, সেমিফাইনালে অধিনায়কচিত ইনিংস খেলে ধুল এবং বিশেষ যোগদানে সক্ষম রশীদ ছাড়াও আরও কতক অসাধারণ পারফরমার ছিল।

পাকিস্তানের অধিনায়ক কাসিম আকরামের পরে ভারতের রাজ বাওয়াই কাপের দ্বিতীয় বোলার সেই একই ম্যাচে পাঁচটি উইকেট নিতে সক্ষম হয়। আকরাম শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে পঞ্চম স্থানের প্লে অফে এই একই সাফল্য অর্জন করে। রাজ বাওয়া ফাইনালের মতো গুরত্বপূর্ণ এবং টানটান উত্তেজনাপূর্ণ ম্যাচে পাঁচ উইকেটের চমৎকার দেখিয়ে গোটা ক্রিকেট বিশ্বকে তাক লাগিয়ে দেয়। রাজ এই কাপের সর্বোচ্চ ব্যক্তিগত স্কোর ১৬২ করে। নিশান্ত সিন্ধু এবং দিনেশ বানাও খুব ভালো প্রদর্শনের নজির রাখে।

ভারতীয় ছেলেরা তাদের ভূমিকা খুব ভালভাবে বুঝতে পেরেছিল এবং তাতে ক্লিনিকাল সাফল্য অর্জন করতে পেরেছিল। ■

https://www.facebook.com/groups/183364755538153

নতুন বই

**প্রখ্যাত সাহিত্যিক নাহার আলমের রচিত গল্প সমূহের একটি অনবদ্য সঙ্কলন...**

প্রাপ্তিস্থলঃ বুনন প্রকাশন, সিলেট, বাংলাদেশ

https://www.rokomari.com

ভারতে শীঘ্রই আসছে...

# ফিরে গেছে

অনন্যা দাস

আহত শরীরটাকে দেখে বেশ মায়া জন্মালো।
ছুঁয়ে দেখি এখনো প্রাণ আছে তবে অজ্ঞান,
প্রেম ভালোবাসার জরিবুটি ঔষধের যে কার্যকারী গুনাবলী তা দেখে ছিলাম সেই মানুষটার ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে ওঠার পর।
আমি আরো বেশি মায়ায় জড়িয়ে পরলাম।
বার বার চোখের সামনে ভেসে ওঠে সেই আহত শরীরটা।
জীবনে কোনোদিন ভালোবাসা উপলব্ধি করেনি।
সেই উপলব্ধি ছিল প্রথমবারের মতো
বসন্তের শেষে কোকিলের ডাক শুনতে না পেয়ে, অযথা নির্বোধ কোকিলের কাছে কাকুতি মিনতি।
নিশ্চিহ্ন নিঃশ্বাসের শব্দ মাঝে মাঝে শোনা যেত।
রোদ্দুরের আলো মেখে খেলে বেরানো মনটা, আজ দিনের সব ক্লান্তি দূর করা বিকেলবেলায় বৃষ্টি চায়।
ডায়েরির ফাঁকা পাতাগুলো ভরে গেছে হিজিবিজি লেখায়।
ডাকঘর নেই তবু চিঠি লেখার ধুম।
সব যেন তাকে সারিয়ে তোলার কৌশল।
নাকি কিছু নিজের জন্যে, কিছু পাওয়ার আশায়।

# মায়া

প্রশ্নটা জাগে, তবু মৃদু হাসি বাঁধা দেয়।
সকাল গড়িয়ে সন্ধ্যে, সময় ডাক দিয়ে বলতে বলতে ছুটে গেলে...
ওই যে আহত মানুষটা বিকেলের ট্রেনে ফিরে গেছে তার ঘরে।
তুই আর অপেক্ষা করিস না, অন্ধকার ঘরটাতে এবার নিজে আলোটা জ্বালিয়ে নে।
অন্ধকারে যে তোর খুব ভয় করে,
অন্ধকারে যে তোর খুব ভয় করে। ■


**পড়ুন, ডাউনলোড ও শেয়ার করুন**

আমাদের প্রকাশিত (নিঃশুল্ক) ই-বুক

**উপাখ্যান আখ্যান মহাখ্যান**

URL: http://online.fliphtml5.com/osgiu/ozzm/

**অক্ষরাঞ্জলি**

URL: https://online.fliphtml5.com/osgiu/csjb/

**বাংলা ভাষা ও বাংলা ভাষী**

URL: https://online.fliphtml5.com/osgiu/optm/

# ব্যাটারি-বিহীন যুগের পানে

প্রশান্তকুমার চট্টোপাধ্যায় (পিকে)

চারিদিকে বিভিন্ন রকম ইলেকট্রনিক্স গেজেট-এর ব্যবহার বেড়েই চলেছে। এই সমস্ত গেজেট-এ কোনো না কোনো রকমের ব্যাটারি বা সেল ব্যবহার করা হয়। আমরা যখন নির্দ্বিধায় এই সমস্ত গ্যাজেট-গুলো, যেমন হাত ঘড়ি বা ফিটনেস ব্যান্ড বা ক্যালকুলেটর বা মোবাইল ফোন, ব্যবহার করে চলি, তখন কি আমরা একবারও ভেবে দেখি যে খারাপ হয়ে যাবার পর ঐ সেল বা রাসায়নিক দ্রব্য ভরা বাক্সগুলোর কি গতি হয়? বস্তুত সঠিক ভাবে রিসাইক্লিং বা পুনর্ব্যবহারের উপযুক্ত না করে তুলতে পারলে, ঐ ছোট ছোট সেল-গুলোই আমাদের পরিবেশকে ভীষণভাবে দূষিত করে তুলতে পারে। আর যেহেতু গোটা বিশ্বেই ওদের সংখ্যা ক্রমবর্ধমান, তাই ওই দূষণের মাত্রাও খুব দ্রুত গতিতে বৃদ্ধিশীল।

তা ছাড়াও আমাদের প্রত্যেকের হাতেই নিত্য ব্যবহার্য গেজেট-গুলির সংখ্যা বেড়েই চলেছে। তাদের নিয়মিত ভাবে খেয়াল রেখে চার্জ দেওয়া – সেও তো এক ঝামেলা... তা হলে এমন কিছু কি বানানো যায়, যাতে করে ঐ ব্যাটারি-গুলো ছাড়াই আমাদের প্রিয় গেজেট-গুলো চালানো যেতে পারে?

## নব দিগন্ত

আমাদের ব্যবহারকারীদের মনে এই প্রশ্নের উদয় হোক বা না হোক, বিজ্ঞানীরা কিন্তু এই বিষয়ে অনেক দিন আগে থেকেই ভাবনা চিন্তা শুরু করে দিয়েছেন। আজ এই বিষয়েই একটি সাম্প্রতিক সাফল্যের কথা বলব।

গত বছর, মাদ্রিদের আই.এম.ডি.ই.এ. নেটওয়ার্ক্স ইন্সটিটিউট-এর অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর ডমেনিকো গিউস্তিনিয়ানোর (Domenico Giustiniano) নেতৃত্বে বিজ্ঞানীদের একটি দল ব্যাটারি বা অন্য কোনরকম বিদ্যুৎ ব্যবস্থার সাহায্য ছাড়াই বেতার যোগাযোগের ক্ষেত্রে এক নতুন প্রযুক্তির প্রাথমিক অধ্যায়ের কাজকর্মের একটি অভূতপূর্ব প্রদর্শন করেছেন।

দুই নতুন প্রযুক্তি লাই-ফাই (LiFi) এবং রেডিও ফ্রিকোয়েন্সি ব্যাকস্কেটার-এর (Radio Frequency Backscatter) সংমিশ্রণে তাঁরা এই নতুন প্রযুক্তিটির কাজকর্মের সূচনা করেছেন, এবং তাঁরা মনে করেন যে খুব শীঘ্রই স্মার্ট হোম, স্মার্ট সিটি এবং স্মার্ট এগ্রিকালচার-এর ক্ষেত্রে এই প্রযুক্তিটি ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হবে।

২০২৫ সালের মধ্যেই সারা পৃথিবীতে প্রায় ৬৪ বিলিয়ন আই.ও.টি. ডিভাইসেস (IoT Devices) ব্যবহৃত হতে চলেছে। প্রফেসর গিউস্তিনিয়ানো এবং তাঁর সহকারীরা মনে করেন যে ঐ সমস্ত আই.ও.টি. ডিভাইস-গুলো এল.ই.ডি. (Light Emitting Diode) বা অন্য যে কোন আলোর মাধ্যমে চালানো সম্ভব হবে।

খুব সহজ ভাষায়, এল.ই.ডি.-র বা অন্য কোন উৎসের থেকে আসা আলোকের শক্তি দিয়ে ঐ আই.ও.টি. ডিভাইস-গুলোকে চালানোর কৌশলকে এবং এল.ই.ডি.-গুলোকে আন্দোলিত (modulate) করে ডাটা প্রেরণের প্রযুক্তিকেই বলা হয় লাই-ফাই টেকনোলজি। আমাদের চারিদিকে সদা বিরাজমান রেডিও ফ্রিকুএন্সি-গুলোকে প্রতিফলিত করে বা আন্দোলিত করে ডাটা প্রেরণের যে কৌশল তাকেই বলা হয় রেডিও ফ্রিকোয়েন্সি ব্যাকস্কেটার।

ডঃ গিউস্তিনিয়ানোর মতে ওনাদের কাজকর্ম বিজ্ঞানের এক নতুন দিগন্তের আবরণ উন্মোচন করতে চলেছে, যার সাহায্যে ব্যাটারি ছাড়াই, আলোকের মাধ্যমে লম্বা দূরত্বে আই.ও.টি. ডিভাইসেস-এর থেকে ডাটা প্রেরণ সম্ভব হবে।

তিন বছর আগে, যখন ওঁরা রিসার্চ শুরু করেন, সেই সময়ে লাই-ফাই টেকনোলজি এবং রেডিও ফ্রিকোয়েন্সি ব্যাকস্কেটার টেকনোলজি বিজ্ঞানের সম্পূর্ণ দুটি ভিন্ন শাখা হিসাবে স্বীকৃত ছিল। কিন্তু ওনাদের প্রচেষ্টায় এই দুই প্রযুক্তির মেলবন্ধনে এক নতুন দিশার সন্ধান পাওয়া গেছে, এবং এর সাহায্যে আগামী দিনে ব্যাটারি-বিহীন যোগাযোগের প্রক্রিয়াটি সুসম্পন্ন হবে।

বর্তমানে সোলার সেল-এর প্রয়োগও দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই প্রযুক্তির সাহায্যে বিদ্যুৎ উৎপাদন ছাড়াও প্রতিটি সোলার সেল-কে কম্যুনিকেশন রিসিভার হিসাবে ব্যবহার করা সম্ভব হতে পারে। ■

# আলোক চিত্র

ছবির নামঃ আভা...

আলোকচিত্র গ্রাহকঃ শুভাশীষ মুখার্জী

© শিল্পীর লিখিত অনুমোদনে গৃহীত। নকল করা বারণ।

সবাই জানাবেন এই আলোকচিত্রটি কেমন লাগল...

# নূর
## (৩য় পর্ব)
পিনাকী রঞ্জন বিশ্বাস

রাজশাহী থেকে ঢাকা, লম্বা জার্নিতে নূর বেশ ক্লান্ত। নূতন এই গাড়িটা বিয়েতে যৌতুক হিসাবে জামাইকে দিয়েছেন নূরের বাবা। গাড়ি পেয়ে জামাই বেশ গদগদ। সন্ধ্যার কিছু আগে, ওরা এসে পৌঁছায় শ্বশুর বাড়ির দরজায়। প্রথা মেনে নূতন বৌকে মিষ্টি মুখ করিয়ে ঘরে এনে বসান শ্বাশুড়ী মা। নূরও প্রথা মেনে শ্বাশুড়ী মায়ের পায়ে সেলাম কর। শ্বাশুড়ী মা হাতে একটা পাঁচশো টাকার নোট দিয়ে বাড়ি ভর্তি লোকের সামনে গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, “আমার একটাই মেয়ে তার যেন কোন রকম অবহেলা না হয়।” নূর মনে মনে ভাবে এ কোথায় এসে পরলাম? প্রথমেই এমন কথা! পাশ থেকে স্বামীও সরে গেছে। কান্নায় বুক ফেটে যেতে চাইছে।

রাতের খাবার ননদের সাথে খেয়ে নিজের ঘরে প্রবেশ করে নূর। ক্লান্তিতে তার চোখ বন্ধ হয়ে আসতে চাইছে, নূতন জীবনের প্রথম রাত সে জোর করে জেগে রয়েছে। একটু রাত করে স্বামী ঘরে এলে এক উৎকট গন্ধে নূরের নাক জ্বলে উঠল। এ গন্ধ তার চেনা। গাঁজার গন্ধ। পদ্মার

ধারে কিছু বাজে ছেলে প্রতিদিন এর নেশা করে। প্রথম রাত, নূরের বুকটা ফেটে যাচ্ছে, তবু সে ভাবে আস্তে আস্তে এ নেশা থেকে সে তার স্বামীকে ঠিক বার করে আনবে। বাপের বাড়ি থেকে কিনে দেওয়া দামী হাত ঘড়িটা আর হীরের আংটি সে খুব যত্ন করে পরিয়ে দেয় স্বামীর হাতে। স্বামী হাতে আর আঙ্গুলে কি পরলো তা খেয়াল না করে নূরের কাপড় ধরে টানাটানি শুরু করে। নূর এক লাফে খাট থেকে নেমে এক পাশে দাঁড়িয়ে থাকে। এ কি! স্বামীর কি কিছুই তাকে দেবার নেই? শুধুই নেবার আছে শরীরটা? নেশার ঘোরে স্বামী বিছানায় উপুড় হয়ে পরে থাকে। অনেক রাত্রে নূরও এক পাশে গিয়ে শুয়ে পরে।

সারা রাত এক অব্যক্ত বেদনা তাকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়ায়। অনিদ্র রজনীর ক্লেশ কাটাতে ভোর বেলাতেই স্নান সেরে নিয়ে ঘরে ঢুকে দেখে স্বামী ঘরে সাজানো সমস্ত ফুল ছিঁড়ে ছুঁড়ে ফেলছে। তাকে দেখেই রাগে গজগজ করতে করতে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। একটু পরেই শ্বাশুড়ী মা ঘরে এসে বলেন, “প্রথা মেনে ঝাঁটা দিয়ে পুরো বাড়িটা ঝাঁট দিয়ে দাও।” নূর মুখ বুজে ঝাঁট দেওয়া শুরু করে। সমস্ত বাড়িটা নিখুঁত ভাবে ঝাঁট দিয়ে পরিষ্কার করে।

শ্বাশুড়ী মা সব দেখে বলে ওঠেন, “এটাকে কি ঝাঁট দেওয়া বলে? তোমার আম্মু কি শুধু তোমাকে ঘরে বসে ভাত খাইয়ে রেখেছে? আর তুমি দিনে রাতে বসে বসে চাম

পালিশ করে বেরিয়েছো?" মাথা চাপড়ে নিজের স্বামীর উদ্দেশ্যে বলতে থাকেন, ছেলের বাপ কি চোখে দেখে মেয়ে পছন্দ করেছিল, নাকি গায়ে হাত বুলিয়ে? কেন যে মরতে আমি নিজে গিয়ে মেয়ে পছন্দ করলাম না। লজ্জায় ঘৃনায় নূরের কান মুখ লাল হয়ে ওঠে। নিজের ঘরে ফিরে, সে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে। কোথায় আজ জোড়ায় সে তার বাপের বাড়ি যাবে... তা নয় এ কি মানসিক অত্যাচার শুরু হল।

সকাল সকাল রওনা হলেও তো বিকালে গিয়ে একবার দীপুর সাথে দেখা করে কিছু কথা বলে নিজেকে হাল্কা করতে পারত। এ দুনিয়ায় দীপু ছাড়াতো ও কাউকেই কোন কথা কোনদিনই শেয়ার করেনি। আর এখন দেখ স্বামীটিরও দেখা নেই। দুপুরের কিছু আগে ননদ ঘরে এসে কিছু খাবার রেখে বলে যায় – খেয়ে নিস। কিছুক্ষন পরে স্বামী এসে বলে – চলো রওনা হই। নূর কেমন যেন হতবাক হয়ে যায়। না খেয়ে কোনমতে তৈরি হয়ে স্বামীর সঙ্গে বাপের বাড়ির দিকে পা বাড়ায়।

বাপের বাড়ি পৌঁছাতে রাত হয়ে যায়। নূরের মা বাবা জামাইয়ের কাছে জানতে চান এত দেরি হওয়ার কারণ। জামাই গম্ভীর হয়ে শ্বশুর মশাইকে বলে "আপনার সাথে কিছু কথা আছে।" নূরের বাবা সম্মতি দিয়ে বলেন, "তুমি এখানেই বলতে পার।"

জামাই বলে, "আপনার মেয়ে তো আর এক জনের

সাথে প্রেম করে।” নূরের বাবা মেয়ের সম্বন্ধে এ ধরনের একটা কথা শুনে হতচকিত হয়ে কিছু চিন্তা না করেই জামাইয়ের সামনে মেয়ের গালে এক চর মারেন। নূর কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে তার নিজের ঘরে গিয়ে কান্নায় ভেঙ্গে পরে। সারাদিন না খাওয়া, পথের ক্লান্তি, এত বড় অপমান সব মিলিয়ে সে নিজেকে আর সামলে রাখতে পারে না। মা তার জামাই বাবাজিকে বসিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে আসেন। নূরের বাবা এই প্রথম মেয়ের গায়ে হাত তুলে এক অপরাধ বোধে আস্তে আস্তে ঘর থেকে বেরিয়ে যান।

নূরের মা জামাইয়ের জন্য খাবার নিয়ে আসেন, পাশে বসে জামাইকে আদর করে খাওয়ান। খাওয়া হয়ে গেলে জামাইয়ের ঘর দেখিয়ে তাকে বিশ্রাম করতে বলে মেয়ের কাছে যান। নূরের আম্মু মেয়েকে জড়িয়ে ধরে হাউ হাউ করে কাঁদতে থাকেন। মা বুঝতে পারেন কোথাও একটা বিরাট কিছু ভুল বোঝাবুঝি হয়েছে। অনেক কষ্টে মেয়েকে শান্ত করে খাইয়ে নীরবে ঘর থেকে বেরিয়ে আসেন। গভীর রাতে নূরের আব্বু বাড়ি ফিরে না খেয়ে শুয়ে পরেন। জীবনে প্রথমবার সবার সামনে মেয়ের গায়ে হাত তুলে তিনি নিজেকে ক্ষমা করতে পারছেন না।

নূর তার স্বামীর কাছে গিয়ে জানতে চায় কেন সে এ কথা বলল? কি দেখেছে একদিনেই তার মধ্যে? স্বামী গম্ভীর

গলায় বলে, “গত রাতে আমার পাশে কেন শোয়নি তা কি আমি বুঝি না, শুনে রাখো আজ যেটা দেখলে এটা শুধু সিনেমার ট্রেলার। পুরো ফিল্ম দেখা বাকি। যখন যেমন বলবো পোষা কুকুরের মতো তা মেনে চলবে, নচেৎ খুব তাড়াতাড়ি পিকচার দেখতে পাবে।”

নূরের মাথায় আকাশ ভেঙ্গে পড়ে। মনে মনে বলে কি পাষন্ড! এই লোকটার কি নীচু মন। সকাল বেলা ঘুম থেকে উঠে নূর কেমন যেন বোবা হয়ে থাকে। সব কাজই করে কিন্তু কথা বলে না, ভাবে কার কাছে কি বলবে! আব্বু এতদিনে তাকে এই চিনলো? মাত্র একরাত্রেই নূতন ছেলেকে এতটা বিশ্বাসযোগ্য মনে হল? প্রশ্নবানে নিজেই নিজেকে জর্জরিত করে তোলে। মনে হয় একবার ছুটে দীপুকে গিয়ে সব বলে। পরক্ষনেই দীপুর ওপর প্রচন্ড অভিমান হয়, সামনে এক অশনি সংকেত দেখতে পায় সে।

শ্বশুর বাড়ি ফিরে সে বুঝতে পারে শুধু গাঁজা নয় স্বামী মদেও সমান আসক্ত। একমাস পরে স্বামী ডিউটিতে ফিরে যায়। নূর তার শ্বাশুড়ীমাকে স্বামীর নেশা করার কথা বলে। শ্বাশুড়ী মা সব শুনে বলেন, “জানি। নেশা বন্ধ করানোর জন্যই তোমার সাথে বিয়ে দিয়েছি।” নূর বুঝে যায় এখানে আর বেশি কথা বাড়িয়ে লাভ হবে না। সুযোগ বুঝে শ্বশুর মশাইকে একদিন সব কথা গুছিয়ে বলে। শ্বশুরমশাই খুব গম্ভীর হয়ে সব শোনেন। নূর খুব আশা করেছিল বাবা

হয়তো সমাধানের জন্য  কিছু একটা বলবেন। কিছুক্ষন চুপ করে থেকে তিনি হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন, "এত রূপ নিয়ে কি শুধু রাস্তায় ছেলেগুলোর সর্বনাশ করেছো! ছেলের নেশা ছাড়াবার জন্যই তোমাকে নিয়ে আসা। হয় ছেলের নেশা ছাড়াবে নয়তো বাড়ির কাজের লোক হয়ে থাকবে। আমি অন্য মেয়ে দেখে নেব।"

সে গল্প উপন্যাসে এসব পড়ে এসেছে, নিছক গল্প বলে এড়িয়েও গেছে – আর আজ তারই জীবনে এগুলো ঘটে চলেছে! শুধু ভাবে তার আব্বু কি পেয়েছিল এই ছেলের মধ্যে? কে এই পরিবারের খোঁজ তাঁকে দিয়েছিল? আব্বু কেন আরো ভালোভাবে সব কিছু খোঁজ করলেন না? নূরের মাথায় আকাশ ভেঙ্গে পড়ে। ...ক্রমশ ■

# প্রকাশিত সংখ্যা - ২০১৯

http://online.fliphtml5.com/osgiu/genc/

http://online.fliphtml5.com/osgiu/zczy/

http://online.fliphtml5.com/osgiu/btzm/

http://online.fliphtml5.com/osgiu/fyxj/

http://online.fliphtml5.com/osgiu/tebb/

http://online.fliphtml5.com/osgiu/ddla/

http://online.fliphtml5.com/osgiu/btss/

**পাঠকদের সুবিধার্থে** নিঃশুল্ক বাংলা অনলাইন সাহিত্য পত্রিকা **'গুঞ্জন'এর ২০১৯ এ প্রকাশিত সব সংখ্যাগুলির ই-লিঙ্ক পুনরায় দেওয়া হল।**

# প্রকাশিত সংখ্যা - ২০২০

http://online.fliphtml5.com/osgiu/kjbd/

http://online.fliphtml5.com/osgiu/hljw/

http://online.fliphtml5.com/osgiu/lmjq/

http://online.fliphtml5.com/osgiu/dadg/

https://online.fliphtml5.com/osgiu/lgaq/

https://online.fliphtml5.com/osgiu/tefw/

https://online.fliphtml5.com/osgiu/eitj/

https://online.fliphtml5.com/osgiu/vsgw/

https://online.fliphtml5.com/osgiu/lpsr/

https://online.fliphtml5.com/osgiu/xnih/

https://online.fliphtml5.com/osgiu/buzn/

https://online.fliphtml5.com/osgiu/mjwo/

**পাঠকদের সুবিধার্থে** নিঃশুল্ক বাংলা অনলাইন সাহিত্য পত্রিকা **‘গুঞ্জন’এর ২০২০ তে প্রকাশিত সব সংখ্যাগুলির ই-লিঙ্ক এখানে দেওয়া হল।**

# প্ল্যাটফর্ম

## পর্ব - ২

দেবী প্রসাদ চৌধুরী

ওনাদের এই শোচনীয় অবস্থা দেখে আমার কেমন যেন মায়া হল, আমি দাঁড়িয়ে পড়লাম। ওনারা কাছে এলে বললাম, "আপনি বরং আমায় আপনার ব্যাগটি দিন, এটি হালকা আছে। আপনারটা আমাকে দিন।" নিতান্ত নিরুপায় হয়ে, উনি স্যুটকেসটি দিলেন। দেখলাম ওনার চোখেমুখে কৃতজ্ঞতা। আমরা হাঁটছি, প্রায় এক মাইল হাঁটতে হবে। কখনো পাশাপাশি কখনো পেছনে সামনে, আমরা একে অপরকে অনুসরণ করে চলেছি। যেতে যেতে বললাম, "লঞ্চের আগে যেতে পারলে, ঘুমানো যাবে।" মেয়েটি বললেন, 'কি করে আগে যাব?' আমি বললাম, "ওই যে দূরে জেলে ডিঙি দেখেছেন, ওতে যাবো।"

"ওই ছোট্ট নৌকাতে! যদি মাঝ নদীতে ডুবে যায়?"

"তা অবশ্য রিস্ক একটু নিতে হবে।"

"লঞ্চ-এ গেলে হয় না?"

"তাহলেই হয়েছে, আর জায়গা পেতে হবে না। প্রায়দিনই যান্ত্রিক গোলযোগ হয়ে থাকে ঐ লঞ্চটির।" এবার মেয়েটি বললেন, "আমি যে সাঁতার জানি না, ভাইকে নিয়ে···" আমি অভয় দিয়ে বললাম, "কত লোক যাচ্ছে, সবাই কি সাঁতার

জানে? আর সাঁতার জানলেই কি বাঁচা যায়? অদৃষ্টে মরা থাকলে, দুর্ঘটনা কতভাবেই তো ঘটে যেতে পারে।”

মেয়েটি রীতিমতো ঘাবড়ে গেছেন, তিনি বললেন, “যেভাবে গেলে সুবিধে হবে সেভাবেই যাব, আপনি আলাদা হয়ে গেলে আমার ভীষণ কষ্ট হবে।” আমি দেখলাম মেয়েটা বড্ড বেশি অসহায় বোধ করছেন। আমাকে পেয়ে ওঁরা আমার ওপর নির্ভর করতে চান। আমি ওঁদের অবস্থাটা বুঝতে চেষ্টা করলাম। বুঝলাম নিজেকে অন্য সব যাত্রীদের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে নিলেও, এই হতভাগা মেয়েটি এবং তাঁর কিশোর ভাইটিকে আমার রক্ষা করতেই হবে। উনি আমার সাহায্য চাইছেন। আমার শক্ত মনটা ওঁদের প্রতি কর্তব্য সচেতনতায় নরম হয়ে গেছে। কোথা থেকে যেন মনের মধ্যে অসম্ভব শক্তি পেলাম। ওঁরা আমার আশ্রিত ওঁদের ছেড়ে যেতে পারব না। ওপারে একটা বাংক-এর সংকল্প নিয়ে কলকাতা থেকে এসেছিলাম, এখন তিনটে বাংক-এর জন্য আমাকে আগে পৌঁছতে হবে।

আমরা লঞ্চঘাট পেরিয়ে আরো খানিকটা এগিয়ে এসেছি। সামনেই বিস্তৃত নদী। সূর্য অস্ত যাচ্ছে, লাল আভাটা ফারাক্কা নদীর জলকল্লোলে কাঁপছে। দূরে দূরে জেলে-ডিঙিগুলো ভাসছে। কেউ কেউ জাল গুটিয়ে তীরের কাছাকাছি বিশ্রাম নিচ্ছে। মাঝনদীতে ব্যারেজ তৈরি হচ্ছে। পিঁপড়ের সারির মতো কুলি-মজুররা মাটির কাজ করছে। ড্রেজার দিয়ে মাটি ঠেলে ঠেলে দিচ্ছে অথৈ জলরাশির মাঝখানে। সামনেই

কয়েকটি জেলে-ডিঙিতে দু'একজন যাত্রী চড়ছে। যাত্রী পিছু দু'টাকা। মাঝিরা আহ্বান জানাচ্ছে যাত্রীদের। আস্তে আস্তে জলের কাছাকাছি নেমে এলাম আমরা। তারপর একটি নৌকোতে উঠে পড়লাম। ছোট্ট জেলে-ডিঙি, অর্ধেকটায় পাটাতন পাতা, বাকীটা শূন্য। শুধু চারটি পাটাতনের জন্য কাঠ রয়েছে। ওখানেই বসতে হবে, পা ঝুলিয়ে। আমি উঠতেই নৌকো দুলে উঠল।

মেয়েটি ও তাঁর ভাইকে হাত ধরে আস্তে আস্তে উঠিয়ে নিলাম। নৌকো দুলতেই, মেয়েটি আমার বাঁ-হাতটা শক্ত করে ধরে ফেললেন। ওঁদের দু'জনকে আমার দুই পাশে বসতে বললাম। নৌকোয় চড়ে কিশোরটি খুশিতে জল নিয়ে খেলা করতে লাগল। আমার এক পাশে মেয়েটি, অন্য পাশে তার ভাই। পাশাপাশি বসলাম। নৌকোর মাঝখানে আরও চারজন যাত্রী – ছেলে-বুড়ো মিলে আমরা সাতজন যাত্রী, আর দুজন মাঝি।

নৌকো ছাড়ল। মেয়েটি তখনও ঘন ঘন নিশ্বাস নিচ্ছিল। এতটা পথ পেরিয়ে, রীতিমতো সবাই হাঁপিয়ে উঠেছিলাম। আমি বললাম, "গঙ্গার জলে একটু হাত-মুখ ধুয়ে নিন, ভালো লাগবে। উনি কোনরকম দ্বিধা না করে, আমার একটি হাত ধরে রেখে, নদী থেকে জল নিয়ে চোখেমুখে ঝাপটা দিলেন। তারপর নিজের শাড়ির আঁচল দিয়ে মুখ হাত মুছে নিলেন। এখন বেশ ফ্রেশ দেখাচ্ছে।

মাঝি দুজন দাঁড় টানছে। ক্রমশ এগিয়ে যাচ্ছি আমরা

স্রোতের বিরুদ্ধে। জল কেটে কেটে ঐখানে কাজ হচ্ছে। আমরা ভেসে যাচ্ছি লঞ্চঘাট থেকে ক্রমশ দূরে, আরো দূরে। এখনই মাঝনদীতে পড়বো আমরা। নদীর ঠান্ডা হাওয়া আচ্ছন্ন রাখলো আমাদের। 'ভোঁস করে আর্তনাদ করে উঠল ওপারের স্টিমারটা। মেয়েটি শক্ত করে আমার একটি হাত ধরে রেখেছেন। ছাড়াছাড়ি হবার ভয়ে। যেন একই বাড়ির মানুষ আমরা, কেউ কাউকে ছাড়া চলবে না আমাদের। অথচ কেউ কারোর পরিচয়ও জানি না। ন'জন যাত্রী নিয়ে গঙ্গার জলে বিসর্জন হলে – বাইরের পৃথিবী জানতেও পারবেনা ক'জন হারিয়ে গেল অথৈ জলরাশি মধ্যে। তবুও আমরা চলেছি...

এবার মেয়েটি কথা বললেন, "নৌকো যদি ডুবে যায়?" যাত্রীরা ওনার কথায় মজা পেল। আমি অভয় দিয়ে বললাম, "আমি সাঁতার জানি।" প্রতিপক্ষ আমার আশ্বাসে মোটেই খুশি না হয়ে, বরং আরো আড়ষ্ট হয়ে পরলেন ভয়ে। কাঁপা কাঁপা গলায় তিনি বললেন, "আপনি তো বাঁচবেন, আমার নাম সুপর্ণা বিশ্বাস। ১৭৬-এর বি অফিসার কলোনিতে দুঃসংবাদটা দিয়ে দিলে বাবা-মা উপকৃত হবেন।" আমি বললাম, "ডুবলে তো!" মেয়েটি আমার কাছে আরো নিবিড় হলেন। একটা নরম শরীরের স্পর্শ উপলব্ধি করছি আমি। উৎকণ্ঠায় আড়ষ্ট হয়ে একেবারে জড়োসড়ো হয়ে বসেছেন তিনি। ছেলেটি বারবার ঠাণ্ডা জলে হাত ডুবিয়ে খেলা করছিল। নৌকো এবার স্রোতের মুখে, গতি বেড়ে উঠেছে। এখন আর দাঁড় টানছে না মাঝিরা, বৈঠা দিয়ে গতি ঠিক রাখছে।

প্রায় চল্লিশ মিনিটে ওপারে গেলাম। অন্ধকার হয়ে গেছে। ওদিকের বৈদ্যুতিক আলো আর স্টিমার-লঞ্চের আলোগুলি জোনাকির মতো দেখা যাচ্ছে। আমরা যথারীতি মাঝিদের ভাড়া মিটিয়ে মালপত্র নিয়ে 'দার্জিলিং মেল-এ চড়লাম। কামরার ভেতরে আলো নেই। বাইরে বাঁশের খুঁটির মধ্যে ডায়নামোর আলো জ্বলছে। কিছু কিছু যাত্রী ট্রেনের কামরায় উঠছে। বাইরের আলোতে ট্রেনের ভেতরে দেখা যাচ্ছে না কিছু। আমি হাতিয়ে হাতিয়ে দুটো খালি 'বাঙ্ক দখল করে, মালপত্র সাজিয়ে রাখলাম। একটা চাদর ব্যাগ থেকে বার করে নীচের বেঞ্চিতে পেতে নিলাম। ওতে কিশোরটিকে বসিয়ে দিলাম। মেয়েটি তখনও জানলার কাছে দাঁড়িয়ে। ওনাকে বসতে বললাম, সুপর্ণা বসলেন না। একটু দূরে জানলার সামান্য আলোর কাছে দাঁড়িয়ে রইলেন। আমি বললাম, "দেখছি একটা আলোর ব্যবস্থা করতে পারি কিনা। ইঞ্জিন লাগলে আলো জ্বলবে।"

যে মানুষটির প্রতি বলা, তিনি তখনও নিশ্চুপ। খোলা জানালার বাইরে দৃষ্টি তাঁর। শান্ত, উদাসী দৃষ্টি। বড্ড গরম লাগছে, এতটা পথ হেঁটে সবাই হাঁপিয়ে উঠেছিলাম। খিদেও পেয়েছে প্রচন্ড। ভাবছি, ওঁদের রেখে নীচের হোটেলে যাব। ফারাক্কার ইলিশ মাছের ঝোল দিয়ে রাতের আহারটা সেরে নেব। হোটেলে খেলে গরম পাওয়া যাবে সব।

দরজার দিকে এগিয়ে যাচ্ছি। যেতে যেতে বললাম, মালগুলো একটু দেখে রাখবেন। উনি বললেন, "কোথায়

যাচ্ছেন?" আমি বললাম, "নীচে। দেখি, একটা মোমবাতি পাওয়া যায় কিনা।" বেশ কড়া ভাবে বললেন সুপর্ণা, "যাওয়া হবে না।" আমি কিছু বোঝার আগেই তিনি আমার একটা হাত ধরে ফেললেন। আমি প্রশ্ন করলাম, "কেন অন্ধকারে থাকবেন?" উনি বললেন, "এদিকে আমি যে অন্ধকারে একা থাকব সে কথা খেয়াল আছে?" আরো কাছে এলেন একেবারে আমার বুকের কাছাকাছি। ওঁর নিঃশ্বাসের ওঠানামার শব্দ শুনছিলাম। উনি আবার বললেন, "আমার ভীষণ ভয় করছে।" ওনার ভেতরে কিসের এক অজানা ভয় দানা বাঁধছিল, যেটা আমি বুঝতে পারিনি। অবাক লাগছিল এটাই যে, সুপর্ণা আমাকেই বা বিশ্বাস করছে কি করে? আমি ওঁর মুখের দিকে পরিপূর্ণভাবে তাকালাম। দেখলাম, ওঁর চোখ দুটি অন্ধকারেও চকচক করছে – ভয়ে কি উত্তেজনায়, সেটা বুঝলাম না। তবে উনি যে আমার উপর ভীষণভাবে নির্ভর করছেন, সেটা ভালো করেই বুঝলাম। এতক্ষণ ধরে একসঙ্গে কাটিয়ে আমাদের মধ্যে বিশ্বাসের জমিটা তৈরী হয়ে গিয়েছিল। তাই সুপর্ণা এতোটা ভরসা পেয়েছেন। আমাকে দিয়ে তাঁর কোন ক্ষতি হবে না, তা তিনি বুঝতে পেরেছিলেন। আমি নিতান্ত নিরুপায় হয়ে একজন হোটেলের বেয়ারার অপেক্ষায় রইলাম। ওরা আলো দিয়ে খাবারের অর্ডার নিয়ে যায়। ... ক্রমশ ■

গুঞ্জনে লিখতে হলে, আজই যোগ দিন পাণ্ডুলিপিতে

https://www.facebook.com/groups/183364755538153

# প্রকাশিত সংখ্যা - ২০২১

https://online.fliphtml5.com/osgiu/wlch

https://online.fliphtml5.com/osgiu/ymfp

https://online.fliphtml5.com/osgiu/kabb

https://online.fliphtml5.com/osgiu/inhj

https://online.fliphtml5.com/osgiu/nmnj

https://online.fliphtml5.com/osgiu/ckkh

https://online.fliphtml5.com/osgiu/tlro

https://online.fliphtml5.com/osgiu/ehsn

https://online.fliphtml5.com/osgiu/ogbi

https://online.fliphtml5.com/osgiu/zrsw

https://online.fliphtml5.com/osgiu/iirn

https://online.fliphtml5.com/osgiu/uuyz

**পাঠকদের সুবিধার্থে নিঃশুল্ক বাংলা অনলাইন সাহিত্য পত্রিকা 'গুঞ্জন'-এর ২০২১ এ প্রকাশিত সব সংখ্যাগুলির ই-লিঙ্ক এখানে দেওয়া হল।**

নতুন বই
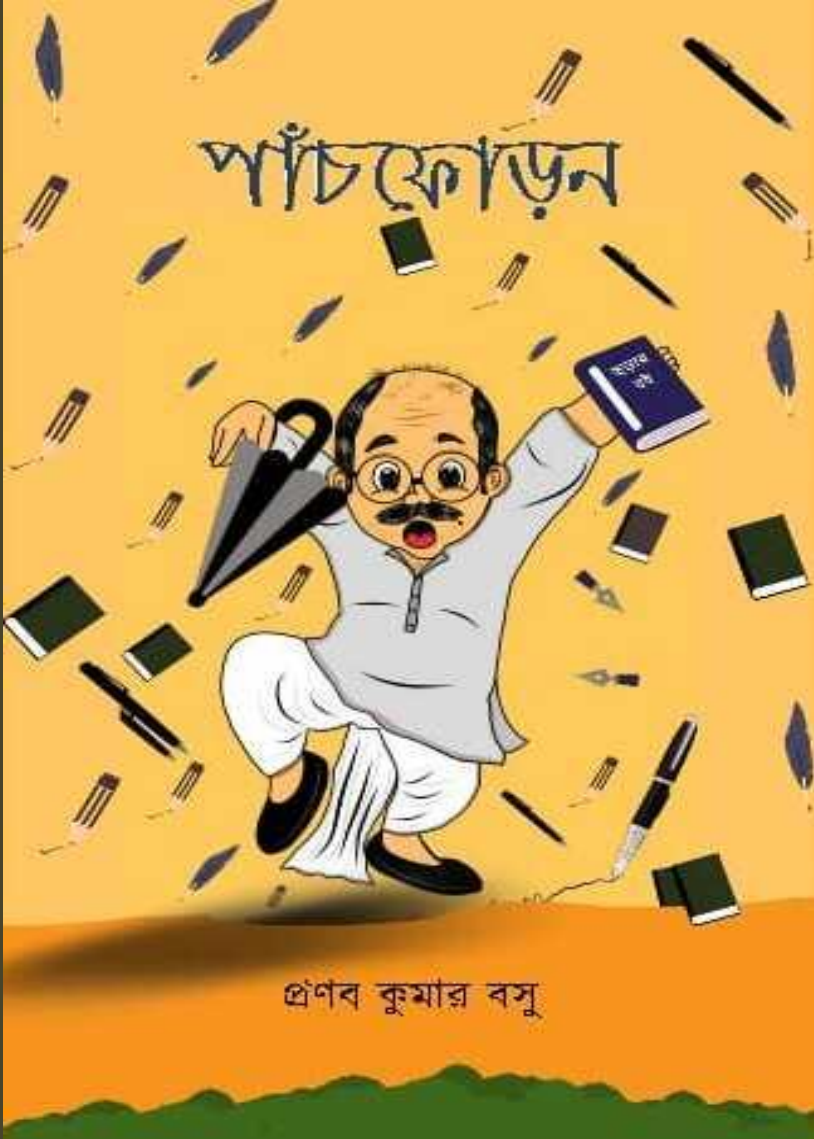
**হাসির মহারাজা প্রণব কুমার বসুর রচনা সমূহের একটি একত্রিত সঙ্কলন...**

প্রাপ্তিস্থলঃ কলকাতা আন্তর্জাতিক বইমেলা - ২০২২

রক্তকরবী, স্টল নম্বর ২১৭

সৃষ্টি প্রকাশনী

# আমার ছোটবেলার শীত

শান্তিপদ চক্রবর্ত্তী

অন্তিম পর্ব

আমার মনে আছে রাস্তার মোড়ে একটা বাগানে তিনতলা সমান উঁচু তেঁতুল গাছের মগ ডালে উঠে বসে বন্ধুরা মিলে গল্প করতাম। কিংবা জলের ট্যাঙ্কের লোহার ঘোরানো সিঁড়ি দিয়ে উঠে ট্যাঙ্কের ছাদে গিয়ে বসে জলছবির মতো শহরের বেশ খানিকটা অংশ দেখতে দেখতে অবাক হয়ে যেতাম। এখন ভাবি কি করে অত উঁচু গাছে বা জলের ট্যাংকে উঠতাম। এটা ওটা চুরি করার সময় ধরা পড়ে বকুনি খেতাম। সস্নেহে লোকেরা বলত, "গাছে উঠে হাত পা ভাঙবি বাবা, বড় আঁকশি দিয়ে পার না বাবা।" তখন শাসনের মধ্যে স্নেহ ছিল। আর এখন বাগানের ফল চুরি করার জন্য মারধর, গাছে ইলেকট্রিক তার জড়িয়ে রাখা এমন কি গুলি করে মৃত্যুর ঘটনাও মাঝে মধ্যে ঘটে যায়।

ও হ্যাঁ, আমাদের বাড়ির পশ্চিম দিকে মৈত্র বুড়োর বাড়ি। বুড়ো একাকী বাড়িতে থাকত। ভীষণ গম্ভীর আর রাগী দেখতে ছিল। ওনাদের একটা পেয়ারা গাছ আমাদের ছাদের পশ্চিম দিকে পাঁচিলের সঙ্গে ডালপালা বিস্তৃত করে ছিল। ঐ

গাছের পেয়ারা অতি সুস্বাধু ও মিষ্টি ছিল। ছাদ থেকে ডালপালা টেনে যা পাড়ার তো পারতাম। এছাড়া দুপুরবেলায় মৈত্রবুড়ো পেট্রোল পাম্পে আড্ডা দিতে চলে গেলে, আমি পিছনের গলি দিয়ে পাঁচিলে উঠে ওদের রান্নাঘরের টিনের চাল দিয়ে গিয়ে পেয়ারা গাছে উঠে, পেয়ারা চুরি করে খেতাম। একদিন দুপুরবেলা বেশ আয়েশ করে গাছের উপরে উঠে বসে বসে পেয়ারা পাড়ছি হঠাৎ দরজা খুলে মৈত্রবুড়োর প্রবেশ। ফেরার কথা নয় কোনো কারণে ফিরে এসেছেন। আমার তো আত্মারাম খাঁচা হয়ে গেল। এই বুঝি বাবা-মাকে ডেকে বলবে, চিৎকার চেঁচামিচি করবে, আশেপাশের দুই একটা বাড়ির লোকজনও জানতে পারবে আর নিন্দা করবে, আর সবচেয়ে বড় ব্যাপার বাবার হাতে মার খাবার ভয় স্ট্যাচুর মত গাছে স্থির হয়ে বসে আছি। যদি মৈত্রবুড়ো ঘরের ভিতরে ঢুকে যায়, আর আমি টুক করে গাছ থেকে নেমে বাড়ি চলে আসতে পারি। কিন্তু না, মৈত্রবুড়ো সোজা গাছের দিকে তাকাল আর আমাকে দেখতে পেল। ভয়ে হাত-পা কাঁপতে লাগল। কিন্তু আমাকে অবাক করে মৈত্রবুড়ো বলে উঠল, “গাছে উঠেছিস হাত পা ভাঙবি বলে? কেন লাঠি দিয়ে যত খুশি পেয়ারা পাড় না, হাত পা ভেঙে শেষে একটা কান্ড করে বসবি।” আমি সুরসুর করে গাছ থেকে নামতে নামতে বললাম, “আর কোনদিন উঠবো না, পেয়ারা পাড়ব না।” আমাকে আরও

অবাক করে মৈত্রবুড়ো বলে উঠল, “তা কেন? এত পেয়ারা তো তোদেরই জন্য। যত ইচ্ছা খা, শুধু আঁকশি করে পেড়ে খাবি বাবা।” যে মানুষটাকে এত রাগী ভাবতাম, আরও কত কি ভাবতাম, সেই মানুষটা এতো ভালো, এতো স্নেহপ্রবণ। তারপর থেকে আর কোনদিন গাছে উঠে পেয়ারা খাইনি। সেই সব ঘটনা আজকালকার ছেলেমেয়েদের জীবনে ঘটে না। সেই মৈত্রবুড়োর মতো আর কাউকে খুঁজে পাইনি।

যেদিন খেলাধুলা হতো না, সেদিন আমাদের দুস্টুমি আরও বেড়ে যেত। পাড়াতে পুকুরের অভাব ছিল না। পানা ভর্তি পুকুরের পানা গাছ জড়ো করে তা মোটা দড়ি দিয়ে বেঁধে ভেলা বানাতাম। নির্দ্বিধায় চার পাঁচজন সেই ভেলার উপর বসে বা দাঁড়িয়ে দুটি বাঁশ দিয়ে নৌকার মতো করে ভেলায় ভেসে ভেসে বেড়াতাম আর রোমাঞ্চিত হতাম। কিংবা পুকুরের পাড়ে আগাছা ও কিছু গাছ গাছালি ভর্তি বনে ঢুকে ঘুরে বেড়াতাম। শুকনো ডাল পালার উপর দিয়ে হাঁটার সময় মড় মড় শব্দে রোমাঞ্চিত হতাম। নানা প্রজাতির পাখি ডালপালার উপর বসে থাকত আর কোকিল সুরেলা কণ্ঠে গান করত। তখন মনে হতো আমরা যেন অজানার দেশে ভ্রমণ করছি। বিকাল তিনটে সাড়ে তিনটে থেকে আমরা নানান খেলায় ব্যস্ত থাকতাম। ডাঙ্গুলি, লাট্টু, কবাডি, খো খো, কিত্ কিত্, নানারকম শারীরিক করসৎ করতাম এমনকি লাঠি খেলাও শিখেছিলাম। সেসব এখন

# স্মৃতিপট

স্মৃতি হয়ে মনের গহনে বেঁচে আছে, আমৃত্যু তাকে সযত্নে লালিত করব।

যখন বিকাল গড়িয়ে সন্ধ্যা নামতো, আর ঠান্ডা উত্তরে হওয়া বইত তখন একরাশ ক্ষিধে নিয়ে বাড়ি ফিরে আসতাম। বাড়িতে ঢুকেই দেখতাম, মা তোলা উনুনে আঁচ দিয়েছেন। গলির মধ্যে ধোঁয়া ভর্তি হয়ে গেছে। ধোঁয়ার গন্ধ আমার খুব ভালো লাগে। যখন উনুনের শিখা লকলকে লাল হয়ে গমগম করত – মাকে বলতাম, "মা খুব ক্ষিদে পেয়েছে।" মা বলত, "একটু বস, আটা মাখছি।" মা আটা মেখে, বেলে, গমগমে আঁচে রুটি সেঁকতো আর গোল গোল ফোলা রুটি থালায় দিত। সঙ্গে সঙ্গে আঙ্গুল দিয়ে উপরের ছালটা ফাটিয়ে দিয়ে খেয়ে ফেলতাম। অধিকাংশ দিন ভেলি গুড় আর মাঝে সাঝে খেঁজুর গুড়, সেই খেঁজুর গুড়ের আর স্বাদ পাই না। তিন-চারটে রুটি খেয়ে একগ্লাস জল খাবার পরে মা বলত, "যা পড়তে বোস গিয়ে, বাবা বাড়ি ফিরে এসে রাগ করবে, আমি চা দিয়ে আসছি।" আমি ঘন্টা দুয়েক ঠিকঠাক পড়তাম। তারপর আর কিছুতেই পড়তে ইচ্ছা করত না। বাবা ঘুরে ফিরে জিজ্ঞাসা করত, "ঠিকঠাক পড়ছিস তো, ইস্কুলের কাজগুলো করে নিয়েছিস তো।"

"হ্যাঁ পড়ছি।" কিন্তু পড়তাম না, পড়তে ইচ্ছা করত না। কিন্তু বাবা ঘোরাঘুরি করত বলে, তাই ইচ্ছা করে একটা যে আমি ঠিকমতো পড়াশুনা করছি।

## স্মৃতিপট

বাবা আর নেই, কিন্তু আজ বড় কষ্ট হচ্ছে ওই ভালো মানুষটাকে ঠকিয়েছি বলে, বড় ইচ্ছা করে একবার ক্ষমা চাওয়ার – কিন্তু ফ্রেমে বন্দি মানুষটার কাছ থেকে ক্ষমা চাওয়া ছাড়া কোনো উপায় নেই। ছোটবেলায় বাবাই অঙ্ক দেখিয়ে দিত, আর অন্য সব সাবজেক্টও পড়াত। বাবার কাছে পড়ে ইস্কুলের পরীক্ষায় এক থেকে চারের মধ্যে থাকতাম। ন'টা বেজে গেলে পেটের মধ্যে যেন ছুঁচো ডন মারত। এতো যে কেন ক্ষিদে পেত তখন? কই এখন তো আর পায় না? মার কাছে ঘুরঘুর করতাম, আর খাবার সময় একে একে ভাইবোনেরা রান্না ঘরে ঢুকে খেয়ে নিতাম। ভাঙা রান্নাঘরের কাঠের দরজার ফাঁক দিয়ে কনকনে ঠান্ডা হাওয়া ঢুকত, দরজা বন্ধ করে দেওয়া সত্ত্বেও একটা ছোট পিঁড়ির উপর বসে খেতাম। স্যাঁতস্যাঁতে রান্নাঘর, তাই ঠান্ডা বেশি লাগত। আমরা সবাই মেঝেতে আসন বিছিয়ে খেতাম। চাকরি পাবার পর প্রথম চেয়ার টেবিলে খাওয়া শুরু করি। রান্না ঘরের মধ্যে হাত মুখ ধুয়ে বিছানায় উঠে বসতাম। খাট পালঙ্ক বলে কিছু ছিল না। একটা ৭''x৫'' চৌকির উপর তোষক পাতা, নিজের হাতে মশারি টাঙিয়ে নিতাম। লেপটা কিন্তু জব্বর ছিল। লাল রঙের লেপ, তাতে সাদা কভার দেওয়া। লেপের ভিতর ঢুকে যাবার খানিক ক্ষণের মধ্যেই শরীর গরম হয়ে উঠত। চোখে নেমে আসতো গভীর ঘুম। এক ঘুমে সকাল, বাবার ডাকে ঘুম ভাঙত।

এখন আর সেই ঘুম হয় না। কমতে কমতে ঘুম এখন চার-পাঁচ ঘন্টায় এসে দাঁড়িয়েছে।

ছেলেবেলাকে হারিয়ে আমি যেন এখন নিসঙ্গ হয়ে পড়েছি। বাবা-মাকে হারিয়েছি, অনেক আত্মীয়স্বজন, বন্ধু-বান্ধবকে হারিয়েছি, হয় ব্যাধিজনিত কারণে নাহলে করোনা নামক দৈত্যের মারাত্মক আক্রমণে, তাই মন এখন বিষাদময়। যাঁরা আছেন তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ প্রায় বিচ্ছিন্ন। মাঠ নেই, তাই নিদির্ষ্ট কিছু জায়গা ছাড়া খেলার জায়গা নেই, বাগান নেই, তাই গাছপালাও নেই, থাকলেও তা সংখ্যায় কম। আম, জাম, তেঁতুল, পেয়ারা গাছ নেই, তাই চুরি করে এমন পাড়ার লোকও নেই, ফেরিওয়ালা নেই, আছে মডার্ন ফেরিওয়ালা – "পুরানো কম্পিউটার, ল্যাপটপ, ওয়াশিং মেশিন, টি- ভি- বিক্রি করবেন গো..." আর আছে গাড়ি করে মাইকে প্রচার করতে করতে কিছু গৃহস্থালীর সামগ্রী বিক্রির ফেরিওয়ালা। শোনপাঁপড়িওয়ালা, ঘুগনিওয়ালা, বাসনওয়ালা, মুম্বাই কুলওয়ালা কেউ নেই। ছোটবেলার ছবি এখনকার ছেলেমেয়েদের মধ্যে আর দেখতে পাওয়া যায় না। সেই অর্থে এখন কারোর সঙ্গে সেরকম বন্ধুত্ব নেই, যোগসূত্র হয়, যদি আমি যোগাযোগ করি। তবে চারপাশে এত মানুষজন, ছোটবেলার থেকে লোকজনের সংখ্যা অনেক অনেক বেড়েছে। তাদের এখন একমাত্র পরম বন্ধুও হচ্ছে মোবাইল।

# স্মৃতিপট

মোবাইল আমাদের জীবন থেকে সবকিছু কেড়ে নিয়েছে। কেড়ে নিয়েছে নিখাদ আড্ডা, সুখ-স্বাচ্ছন্দ, বন্ধুত্ব এমন কি ভালোবাসাও। আমাদের মান আছে হুশ নেই, আমাদের কোন ভালো বন্ধু নেই, যাঁদের মধ্যে এক আধজন আছেন তাঁরা ভাগ্যবান। আমাদের টাকা-পয়সা আছে, সম্পত্তি আছে, কিন্তু মনে সুখ নেই, আমাদের চিকিৎসা বীমা আছে, কাঁড়িকাঁড়ি টাকা আমরা রোগের পিছনে খরচা করি। কিন্তু সুস্থ থাকার কোন চেষ্টা করি না। আমরা বিলাশবহুল বাড়ি বা ফ্ল্যাটে এ-সি- চালিয়ে ঘুমাতে যাই, কিন্তু আমাদের চোখে কোন ঘুম নেই। আমরা চাকরির বড় বড় প্যাকেজের দিকে ছুটে চলি অথচ বাবা-মাকে দেখি না।

আমরা শৈশব, কৈশোর লেখাপড়া আর যৌবনে উপার্জনের পিছনে ছুটে বেড়াই কিন্তু প্রবীণ হলে ভাবি জীবনে তো কিছুই করা হল না। আমরা দুর্বল ও অসহায়দের উপর অন্যায় করি কিন্তু অসৎ বিত্তবান লোকেদের তেল লাগাই, তোষামোদ করি, গরীব দুঃখীদের কোনরকম সাহায্য করি না। উল্টে তাদের পদে পদে হেনস্তা করি। আমরা রাজনীতির কিছু বুঝি না অথচ গলা ফাটিয়ে রাজনীতির আলোচনা করি। আমরা সৎ লোককে সবসময় বিপদে ফেলার চেষ্টা করি, আর কাঠিবাজি করতে আমরা চরম সিদ্ধহস্ত।

## স্মৃতিপট

আমরা হলাম শেষ জেনারেশন, আমরা সব কিছু জীবনে দেখেছি এবং পেয়েছি। আমরা পিতা-মাতা ও গুরুজনকে শ্রদ্ধা ভক্তি করেছি, বাবা-মার স্নেহ ভালোবাসা পেয়েছি। বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে খেলেছি, ঘুরেছি, একসঙ্গে পিকনিক করেছি, নিখাদ আড্ডা মেরেছি, লোকের বিপদে আপদে ছুটে গিয়েছি, সেই অর্থে জীবনকে আমরা প্রকৃত অর্থে ভোগ করেছি। কিন্তু জীবন সায়াহ্নে এসে আমরা সবাই একা হয়ে গেছি। তাই এই জীবন ফুরিয়ে যাবার আগে শুধু একবার, শুধু একটিবার ছোটবেলাকে ছুঁতে চাই। পরম করুণাময় ঈশ্বরের কাছে আমার শেষ ও একটিমাত্র প্রার্থনা, “হে ভগবান, তুমি শুধু একটিবার, অন্তত স্বপ্নের মধ্যে আমার ছোটবেলাকে দেখতে দাও, ছুঁতে দাও।” (সমাপ্ত) ■

### ‘গুঞ্জন’-এর ২০২২-এর আগামী সংখ্যাগুলির বিষয়বস্তু

মার্চ – নারী সংখ্যা (কাজ চলছে)

এপ্রিল – সংস্কৃতি সংখ্যা

মে – শ্রমিক দিবস সংখ্যা

জুন – বর্ষা বরণ সংখ্যা

জুলাই – রহস্য, রোমাঞ্চ, কল্পকাহিনী সংখ্যা

অগাস্ট – মৈত্রী ও স্বাধীনতা সংখ্যা

*বিশেষ কারণে এই সুচী পরে পরিবর্তিত হতে পারে...

# পাণ্ডুলিপির প্রকাশিত গ্রন্থ
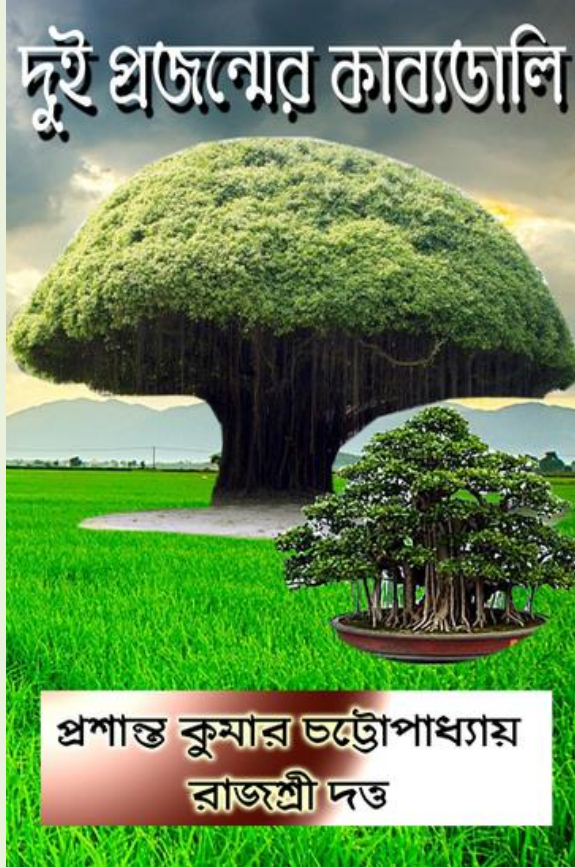
দুই প্রজন্মের দর্শনের ওপর ভিত্তি করে, বর্তমানের কিছু চিত্র শুধু ভাষার মাধ্যমে একত্রে উপস্থাপন করেছেন দুই প্রজন্মের দুই কবি। আধুনিক কবিতা প্রেমীদের জন্য একটি অসামান্য কবিতা সংগ্রহ।

প্রাপ্তিস্থলঃ 1) www.flipkart.com

(Search Words: dui-projonmer-kabyadali)

2) E-mail: contactpandulipi@gmail.com

# পাণ্ডুলিপির প্রকাশিত গ্রন্থ

মুল্যঃ ৮০ টাকা [অনলাইনে কুরিওর শুল্ক অতিরিক্ত]

অ্যামাজন লিঙ্কঃ

https://www.amazon.in/gp/offer-listing/8194223695/ref=dp_olp_new_mbc?ie=UTF8&condition=new

এখন কলেজ স্ট্রীটেও পাওয়া যাচ্ছে।

ঠিকানাঃ আদি নাথ ব্রাদার্স, শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট

কলকাতা – ৭০০০৭৩ ● দূরভাষঃ +৯১ ৩৩ ২২৪১ ৯১৮৩

# অতৃপ্ত প্রেম

অনির্বাণ বিশ্বাস

নিভে যাবার আগে
একটা গোলাপ তুমি দিও,
সমুদ্রের থেকে নেওয়া দুফোঁটা
চোখের জলে যদি- থাকে আঁকা,
আমাদের প্রথম দৃষ্টি বিনিময়ের
ঝাপসা ছবি, কিংবা তোমাকে
প্রথম গোলাপ দিতে গিয়ে
নিঃস্ব হওয়া ফুটো প্যান্টের পকেটটা জানো,
ঠিক কপালের মতো,
সবসময়েই সব পছন্দসই জিনসটা
হয় সাধ্যের অতীত বা,
আগে আসা কোনো মানুষের
জন্য, বরাবরই হওয়া অতীত
আমার অধরা প্রেম।
তবুও, তোমার জন্য একবুক
এই ভালোবাসা,
বাবুই হতে না পেরে শেষে
চড়ুই পাখির মতো বাঁধে বাসা।
কোনো বিশেষ দিনে, তোমার পছন্দসই

# অপূর্ণতা

কোনো মানুষের সঙ্গে
দূরের দেখা তোমার রূপের মাধুর্য
আমার মনকে আজও ভেজায়,
অকালে ঝরা বৃষ্টির মতো।
আমার ভালোবাসা সেই অকালে ঝরা ফুলেরই মতো
সে গন্ধ তো দিলো কিন্তু --
না অর্পিত হলো ঈশ্বরের চরণে
না পেলো কারোর স্পর্শ।
পদদলিত হয়েও তার নেই কোনই বেদনা,
কারণ অসফল প্রেমেরই মধ্যে থাকে,
সম্পূর্ণরূপে নিজের সঁপে দেওয়া শ্রদ্ধাঞ্জলি, আর
অন্তর্দগ্ধ হৃদয়ের অসহনীয় মধুর যাতনা পূর্ণতাপ্রাপ্তি!
সে তো কপালের লিখন
অপ্রাপ্তিতেও আছে এক অজানা-অচেনা
আলোর দিকে ধেয়ে যাওয়া পোকারই মতো
যন্ত্রণায় হাসিমুখে পোড়ার অসহনীয় মধুর-মরণ।
বুঝেও অবুঝের মতো তোমার উপেক্ষা,
যেনো, চিরকালই থাকবে সতেজ,
অন্তর্লীন হওয়া আজ এ শরীরেও,
অনন্তকাল অকৃত্রিম এ এক অসম,
প্রেমময় অতৃপ্ত প্রতীক্ষা।। ■

গুঞ্জন পড়ুন ও গুঞ্জন পড়ান
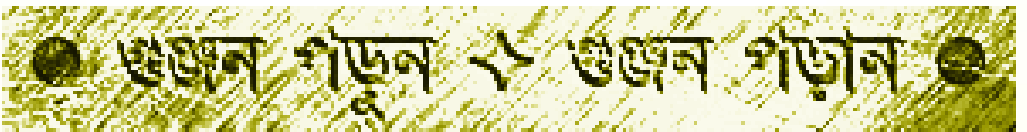
# আলোক চিত্র

**ছবির নামঃ মাঝিরা চলেছে...**

**আলোকচিত্র গ্রাহকঃ রাজশ্রী দত্ত (নীলাঞ্জনা)**

© শিল্পীর লিখিত অনুমোদনে গৃহীত। নকল করা বারণ।

**সবাই জানাবেন এই আলোকচিত্রটি কেমন লাগল...**

# সবিনয় নিবেদন

'গুঞ্জন' কেমন লাগল তা অবশ্যই আমাদের জানাবেন। আর আপনার লেখা 'গুঞ্জন'-এ দেখতে হলে, আপনার সবচেয়ে সেরা (আপনার বিচার অনুযায়ী) এবং অপ্রকাশিত লেখাটি আমাদের 'ই-মেল'-এ (contactpandulipi@gmail.com) পাঠিয়ে দিন (MS Words + PDF দু'ট 'ফরম্যাট'-ই চাই)। সঙ্গে আপনার একটি 'পাসপোর্ট সাইজ'-এর ছবিও অবশ্যই থাকা চাই – সাইজঃ ৩৫ mm (চওড়া) X ৪৫ mm (উচ্চতা); রিসল্যুশনঃ 300 DPI হওয়া চাই। আর Facebook এর **'পাণ্ডুলিপি (গল্প, কবিতা, গান, গদ্য ও নাটকের আসর)'** গোষ্ঠীতে অবশ্যই আপনার নিয়মিত উপস্থিতি একান্ত প্রার্থনীয়। তবে লেখা অনুমোদনের ব্যাপারে বিচারক মণ্ডলীর সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত।

**বি.দ্র.: মার্চ ২০২২ সংখ্যার লেখা পাঠানোর শেষ তারিখঃ ১৫ই ফেব্রুয়ারী, ২০২২**